‘কবিতা থেকে কবি - নরেশ গুহ’ — গল্পযাপন

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

“এক বর্ষার বৃষ্টিতে যদি মুছে যায় নাম
এত পথ হেঁটে, এত জল ঘেঁটে, কী তবে হ’লাম?”
[এক বর্ষার বৃষ্টিতে, দুরন্ত দুপুর]

কবি নরেশ গুহ (৩১ মার্চ, ১৯২৩ — ৪ জানুয়ারি ২০০৯) শতবর্ষ ছুঁয়েছেন। কবিকে চিনতাম না। হঠাৎ একটা কবিতা উড়ে এল আর জুড়ে বসল আমার মনে... সময়টা তখন স্বপ্ন আর কল্পনা দিয়ে মোড়া; মফস্বলের বাড়ির পাতকুয়োর পাড়ে বসে ছুটির দিনের অবকাশে বাবা অনর্বল কবিতা পড়ে যান — শুরু হয়ে যায় আমার নতুন নতুন খেলা; শব্দের ভেতরে ছবি আর ছন্দ নিয়ে খেলতে খেলতে সাজিয়ে তুলি সংসার :

“আমি যদি হই ফুল, হই ঝুঁটি-বুলবুল হাঁস
মৌমাছি হই একরাশ....
তবে আমি টুপটুপ নীল হ্রদে দিই ডুব রোজ,
পায় না আমার কেউ খোঁজ।...
হোক আমার এলোচুল, তবু আমি হই ফুল লাল,
ভ’রে দিই ডালিমের ডাল।
ঘড়িতে দুপুর বাজে, বাবা ডুবে যায় কাজে,
তবু আর ফুরোয় না আমার সকাল।” [রুমির ইচ্ছা]

পুরনো সেই বাড়িতে ছিল একটা বাগান। আমার ছোট চুল লম্বা করে নিয়েছিলাম গামছা বেঁধে; বাগানের গাছে গাছে ছেয়ে থাকত জবা ফুলের লাল, ডালিমের বদলে ছিল পেয়ারার গাছ, লতানো বেলির ডালে ঝোঁটন বুলবুলির বাসা, কাঁঠাল গাছের ডালে মৌচাক আর নীল হ্রদের বদলে হাঁস-চরা সবুজ পুকুর — সব মিলিয়ে আমি খুব ভালভাবেই জানতাম কবিতাটা আমাকে আর আমার বাবাকে নিয়ে লেখা।

খেলনাবাটির দিন শেষ। বদলে গেল বাড়িটার ভূগোল, বাগান তখন শুধুই ইতিহাস। কলেজে ঢুকেছি;

হঠাৎই একদিন পড়তে পড়তে আবিষ্কার করলাম : কবিতার নাম 'রুমির ইচ্ছা' আর কবির নাম নরেশ গুহ। আরও অনেক পরে — তখন কলেজে পড়াচ্ছি; কৃষ্ণনগর গভ: কলেজের লাইব্রেরিতে খুঁজে পেলাম : 'W. B. Yeats, An Indian Approach' (1968); যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বইটি বহুদিন ছাপা হয়নি। আমার নথিভুক্ত গবেষণার জন্যে খুঁজছিলাম। সহকর্মী ইংরেজির অধ্যাপক প্রবীর কুমার হুই ছিলেন কবির অনুরাগী। তাঁরই সৌজন্যে আলাপ হয়ে গেল বইটির লেখকের সঙ্গে; বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছিলাম কবি নরেশ গুহকে — ছোটবেলার সেই ভূগোলের পরিসর, শব্দবাহিত চিত্রধ্বনি সংক্রমণের ইতিহাস আবার আচ্ছন্ন করল আমাকে — সে অনেক দিনের কথা, ২০০৩ সালের ২৩ মে।

যাতায়াত শুরু হল নিয়মিত। ৫ নম্বর সত্যেন্দ্র দত্ত রোডের দোতলায় কবির ঘর — কবিতার ঘর; দেশি, বিদেশি ছবি, শিল্পকলা আর বই দিয়ে সাজানো ঘর। অপেক্ষা করেন নির্ধারিত দিনে; পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ, নিজের হাতে চা করে এগিয়ে দেন, কাপের নিচে পড়ে থাকে দু-চারটি পাতা — ধীরে ধীরে রং আর গন্ধ ছড়ায় গল্পের সঙ্গে সঙ্গে — লাস্ট মেট্রোর তাড়ায় ফিরতে ফিরতে বাঁকের মুখে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি গোল বারান্দায় তখনও দাঁড়িয়ে আছেন তিনি — আভিজাত্য আর পারিপাট্য মানুষটিকে করেছে স্বতন্ত্র। দেখলাম নরেশ গুহ-র কবিতা নিয়ে তেমন কোনও কাজ হয়নি। নথিভুক্ত গবেষণাপত্র জমা দিয়েই শুরু করলাম 'কবিতা সংগ্রহ' (১৯৯৩) নিয়ে। কবি বহুপ্রজ নন : 'দুরন্ত দুপুর' (১৯৫২) প্রথম কাব্য; এরপর 'তাতার সমুদ্র ঘেরা' (১৯৭৬), 'বিদিশার ইনি আর উনি' (১৯৯৩) এবং 'পরবর্তী কবিতা'। অধ্যাপক হুই বললেন, Author is dead, অতএব পাঠকই ভাববে নিজের মতো — এই থিয়োরি নয়; অন্যভাবে ভাব।

ভাবতে ভাবতে 'কবিতা সংগ্রহ' -এর কবিতাগুলো আমার কাছে আর শুধু কবিতা হয়ে রইল না; এক একটা জানলা হয়ে খুলে গেল গল্পের আকাশ — কবিতা মাঝখানে রেখে সেই জানলায় দুদিকে বসি আমরা দুজন — কবি আর পাঠক। সময়ের 'ট্রেন' এগিয়ে চলে :

.....''ঘুরন্ত চাকায়
শব্দের পাঁজর ভাঙে, চূর্ণ হয় সময়ের বুক :
এর চেয়ে দুঃখ দ্রুত? রোমাঞ্চিত এর চেয়ে সুখ?
কখন পেরিয়ে গেছি শেষরাতে — আলো-জ্বলা, ঘুমে অচেতন,
দুরাশার সিঁড়ি তোলা অজানা স্টেশন।"

সময়ের সঙ্গে সম্পর্ক এগোয়, গল্পে জমে ওঠে — আর লেখা হতে থাকে কবি নরেশ গুহকে নিয়ে প্রথম বইটি : কবিতা থেকে কবি : নরেশ গুহ।

বিন্যাফৈর (টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত ময়মনসিংহ জেলা; বর্তমানে বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলা) গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এলেও কবি আনমনা হয়ে যান গ্রামের কথায়; মনে পড়ে একটা গান আর কষ্ট হয় :

''আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি,
তাই ভোরে উঠেছি —"

ভোরের আকাশ অরুণাভ, ডোয়ারকিনের অর্গান বাজিয়ে বাবা গান গাইছেন —

পিতামহ ছিলেন কোচবিহার মহারাজের এস্টেটের পদস্থ কর্মচারী। রুচিশীল, সংস্কৃতিমনস্ক পিতা

রমেশচন্দ্র গুহবক্সির ছিল ছোটখাটো তালুক। বাড়িতে ছিল স্বরলিপির স্তুপ, বিভিন্ন রচনাবলী, হোমিওপ্যাথির বই, রান্নার বই আর 'রামধনু', 'পাঠশালা', 'মৌচাক', 'নারায়ণ', 'প্রকৃতি', 'প্রবাসী' — এইসব পত্রপত্রিকা (যেগুলো নিয়মিত বাড়িতে আসত)। বাবার বহু বিষয়ে আগ্রহ ছিল : ক্যামেরায় ছবি তোলা, বাড়িতেই ডার্করুমে প্রিন্ট করা; হাতবাক্সের মত প্রিন্টিং মেশিনও ছিল, যেখানে ছোটবেলাতেই অক্ষর সাজাতে শিখেছিলেন তিনি। বন্ধুহীন শৈশবে বই-ই ছিল সঙ্গী। গাছগাছালি ঘেরা সেই বাড়িতে অনেক পাখি আসত। দুইদিকে ডাল ছড়িয়ে ভাগ হয়ে যাওয়া একটি নিচু আমগাছে পা ছড়িয়ে শুয়ে শুয়ে বই পড়তেন। মা-ও গান গাইতেন। তাঁর ছিল হাতের গুণ; পূর্ব বাংলায় যাকে বলত 'আস্য' (যার হাতে কাসুন্দি তৈরি হয়)। মাটিলেপা উঠোনে শুকোত সারি সারি কাসুন্দি। পানসি নৌকায় চড়ে মাতামহের বাড়ি বাঙ্গলা গ্রামে যাওয়ার ভ্রমণকাহিনী 'ভাইবোন' পত্রিকায় লিখে তিনি পদক পুরস্কার পেয়েছিলেন। প্রভাতকিরণ বসুর 'ভাইবোন' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম কবিতা 'ভাদর এলো রে ভাই' (ভাদ্রমাস বিষয়ে)। গ্রামের বিবাদে অতিষ্ঠ কবি আর গ্রামে থাকতে চাননি। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর চলে এসেছিলেন কলকাতায়। অনেক পরে শহরও বাসযোগ্য মনে হয়নি। কিন্তু সেদিন বাধা দিয়েছিলেন শিল্পী যামিনী রায় : 'চারপাশের অসঙ্গতি-আঘাত যদি সহ্য করতে না শেখেন তবে কি করে শিল্পী হবেন? আঘাতকে প্রত্যাখ্যান করতে শেখায় শিল্প।.... যত খারাপ লাগবে ততই থাকতে হবে।' শিল্পীর কথায় সেদিন তিনি শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে না গেলেও ছায়াচ্ছন্ন গ্রামের স্মৃতি তাঁকে আজীবন আচ্ছন্ন করেছে :

''ছায়ায় ছোপানো মাটিলেপা ঘর
ক'টি মানুষের, আপন দেশের?" (প্রশ্ন ১)

জীবনের নদী উজানে ফেরে না। বাবাকে খুশি করার জন্যে প্রথমে বিজ্ঞান পড়লেও পরে সাহিত্য নিয়েই পড়াশোনা করলেন। রিপন কলেজে পড়বার সময় শিক্ষক হিসেবে পেলেন বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, প্রমথনাথ বিশীকে। 'কবিতা' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল 'শরতের এক ফালি জমি' কবিতাটি নরেশচন্দ্র গুহবক্সির নামে (এটিই তাঁর পৈতৃক নাম পদবী যা পরবর্তীকালে তিনি নিজে সংক্ষেপ করেন : নরেশ গুহ)।

গ্রাম থেকে শহরে এসে ওই বছরেই ১৬ বছরের কিশোর পৌষের প্রচণ্ড শীতে পায়ে হেঁটে এক বন্ধুর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে যান। উপহার পাওয়া ক্ষুদ্র আপেলের আকারের 'বেবি ব্রাউনী' ক্যামেরায় রবীন্দ্রনাথের ছবি তোলার কাহিনি রীতিমতো রোমহর্ষক। নিষেধের বাধা বৈধ উপায়ে টপকানো অসম্ভব জেনে কাঁটা গাছের তলা দিয়ে প্রায় কুকুরের মতো গলে সন্ধানী কিশোর পৌঁছে যান রবীন্দ্রনাথ সমীপে। কপর্দকশূন্য কিশোর পাঁচ টাকা দিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে পারেননি। পরদিন পেশাদার ক্যামেরাম্যানকে অপ্রস্তুত করে কীভাবে রবীন্দ্রনাথের ছবি তুলেছিলেন এবং পরে সেই ছবিতে স্বাক্ষর করেছিলেন কবি, সে সত্যিই এক বৃত্তান্ত ('রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি তোলার বৃত্তান্ত', নরেশ গুহ, 'বৈশাখী', ২০০৭)।

গ্রামে থাকতেই 'প্রবাসী' পত্রিকায় ময়ূরভঞ্জের কথা পড়ে, ছবি দেখে, নামটির ধ্বনি গুঞ্জরণে মুগ্ধ কিশোর স্বপ্ন আঁকত। 'ময়ূরভঞ্জ' (দুরন্ত দুপুর / দুরন্ত দুপুর) এবং 'ময়ূরভঞ্জের পথে' ('তাতার সমুদ্র-ঘেরা' / তাতার) দুটি কবিতায় ছায়া ফেলেছে অনুভব-অভিজ্ঞতা :

"শত কবিতার ঘুমভাঙা ভোরে এনেছিলে কচি আম
সে-কোন গ্রামের সাঁওতাল মেয়ে, ভুলেছো কি তারো নাম?
বিকেলে ঝরল একটি বাতাস পাকা মহুয়ার মতো
চুম্বনে-নত-চৈত্রগোধূলিরক্তিম বনতলে,
হে পর্যটক, গেছো কি ভুলে?" [ময়ূরভঞ্জ]

"নিরাপদ ফাঁক রেখে এঁকেবেঁকে একটু দূরে থামে
ময়ূরভঞ্জের এক নাম-না-জানা গ্রামে।
জানা হয় না, কেন তন্বী দুই সখী উসখুস ক'রে হাসে
জন্মজন্মান্তরের চৈত্রমাসে।

এঞ্জিনের তন্দ্রা ভেঙে একসময় দুলে ওঠে গাড়ি :
আর একটু দাঁড়ালে হ'তো, কিছুই ছিলো না তাড়াতাড়ি।" [ময়ূরভঞ্জের পথে]

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে সম্পূর্ণ একাকী পকেটে মাত্র চারটি টাকা সম্বল করে পদস্থ এক পুলিশ অফিসারের লিখে দেওয়া পরিচয়পত্র নিয়ে ১৭ দিনের সেই ভ্রমণে পথে কত মানুষের আতিথ্য পেয়েছেন, তেমনি পুলিশি সন্দেহে পদে পদে পেয়েছেন বাধা। এখানেই কবির হয়েছিল হৃদয়বিদারক এক অভিজ্ঞতা

> "হাঁটতে হাঁটতে ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদায় পৌছলাম। এপ্রিল মাসে তখন অসম্ভব গরম।... ময়ূরভঞ্জের রাজাদের অতিথিশালায় ছিলাম। একদিন রাত্রিতে সাংঘাতিক একটা কাণ্ড ঘটল। রাত্রি একটা-দেড়টার সময় শুনলাম, একটা মেয়ে অতিথিশালার উঠোনে চিৎকার করে কাঁদছে; বেরিয়ে দেখলাম, চারিদিকে বহু লোক জমা হয়েছে; এবং একজন কেউ মেয়েটিকে চুলের মুঠি ধরে উঠোনের ভেতরে ঘোরাচ্ছে শোওয়া অবস্থায় — পরে শুনলাম, রাজার কোনো এক দুশ্চরিত্র আত্মীয় মেয়েটিকে উপভোগ করতে ইচ্ছে করেছেন। মেয়েটি রাজি হয়নি। তাই এমন শাস্তি হচ্ছে তার। পরে একটা গাড়ি এসে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে গেল। কেউ বাধা দিতে পারেনি। অনেক রাত্রিতে, প্রায় ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে দেখলাম গাড়ি এসে ফিরিয়ে দিয়ে গেল মেয়েটিকে। মেয়েটি তখন সমানে কেঁদে চলেছে — দেখলাম, দেশীয় রাজ্যে, মেয়েদের ওপর কী ধরণের অত্যাচার হয়।"

'মৃত্যুর পাখি' (দুরন্ত দুপুর) কবিতায় স্পষ্ট করে উল্লেখ না থাকলেও জড়িয়ে রয়েছে মায়ের মৃত্যুর স্মৃতি :

"চ'লে যেতে হবে? মনে হয় যেন মায়া।
বর্ষার ঘাট জলে ছলছল,
অনুরাগে আঁকা চোখের কাজল, ...
ঘুম চোখে নেই; স্বপন বিছানো ঘরসংসার পাতার।"

কবিতাটি রচনাকাল ১৯৪৪-৪৫, কবি তখন এম.এ. পড়ছেন। মায়ের মৃত্যু ১৯৪৩-এ শীতের সময়।

মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে দেশে যান কবি। তখন তাঁরা ছয় ভাই, দুই বোন। আবারও সন্তানসম্ভবা মা গুরুতর অসুস্থ। মৃত সন্তানটিকে কবিই স্বহস্তে কবর দেন। মাকে বাঁচাবার মরিয়া চেষ্টায় তিনি ডাক্তারকে রাজি করালেন; আধুনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে ডাক্তার জ্ঞাত ছিলেন না। কবির শরীরের রক্ত নিয়ে সরাসরি মায়ের শরীরে দেওয়া হয়েছিল :

> ''আমিই তাদের বারবার অনুরোধ-উপরোধ করি যদি মা কোনো উপায়ে বাঁচেন কিন্তু এভাবে তো হয় না! (দীর্ঘশ্বাস ফেললেন) দেহে রক্ত প্রবেশ করানোর অল্পক্ষণ পরেই মা মারা গেলেন"—

মায়ের মৃত্যুর পর বাবা আমৃত্যু পূর্ব পাকিস্তানেই রয়ে গেলেন স্থানীয় মানুষের সহায় হয়ে। দেশভাগের পর নিরাপত্তার কারণে দুই বোনকে ভারতে আনতেই হল। আরও পরে বাকি পাঁচ ভাইও একে একে চলে আসেন। পাইকপাড়ার রাজবাড়ির উল্টোদিকে বস্তিমতো এলাকায় এক আত্মীয়ের বাসাবাড়ির খানিকটা অংশ ভাড়া নিয়ে থাকতেন। কবির তখন কঠোর জীবনসংগ্রাম। পাইকপাড়ার বাড়ি থেকে ভোরে বেরিয়ে চারুচন্দ্র কলেজ আর রাতে 'যুগান্তর'-এর অফিসে কাজ :

> ''ভোরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসি, কাজে চ'লে যাই,
> ধুলোয় কাদায় ধোঁয়ায় বাষ্পে নিজেকে হারাই।
> অপমানে পাপে আত্মাকে আমি যত করি ক্ষয়..." [শকুন্তলা / দুরন্ত দুপুর]

জায়গার অভাব ছিল সে বাড়িতে; ঘুমোতে হত খোলা আকাশের নিচে, এমনকি শীতের সময়েও। 'জীবিকার পশুটার লোমশ থাবায় বিদীর্ণ হ'য়েও' কবি শুনিয়েছেন 'মহাপুণ্যবলে' বেঁচে থাকার কথা, যদিও শ্লেষ মিশে আছে শব্দে :

> ''কলকাতায় বেঁচে আছি শুধু এই মহাপুণ্যবলে
> এখনো গলির মোড়ে সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় আলো জ্বলে,
> ভোরে কলে জল আসে, পাশের বাড়ির
> দ্বিতল রেলিঙে ঝোলে সদ্যস্নাত জাফরানী শাড়ির
> আঁচলের প্রান্তভাগ।" [অলৌকিক]

> ''আশ্চর্য এই পৃথিবীতে এসবের মধ্যে সবাই আমরা বেঁচে আছি — মাছি, পিঁপড়ে, কুঁকড়ো এবং আমি। আর আছে জানলা পেরিয়ে দূরের দু'গজ আকাশ। এসবই কলকাতায় থাকার 'মহাপুণ্য' । এরই মধ্যে আছে কলকাতার বইয়ের দোকান। বই কিনে পড়া যায়। সারাদিন কাজ করছি, রাতেও; ছ'দিন ছ'রাত পরে একটি রবিবার এসে মুক্তির আনন্দ দেয়।"

বাড়ির দরজায় ডাকবাক্সে রোদ্দুর এসে পড়ে — লৌকিক ভুবনকে পেছনে ফেলে রচনা করে অলৌকিক রসের জগৎ :

> ''...অলৌকিক কে ডাকপিওন,
> রেখে যায় রোদ্দুরের চৌকো খামগুলি!" [অলৌকিক]

কবিতাটি লেখা শুরু হয়েছিল কফি হাউসে। উপলক্ষ ছিলেন বন্ধু কবি অরুণকুমার সরকার। তাঁর চিঠিতে রয়েছে একরাশ মুগ্ধতা (১৭.০৬.১৯৪৯) :

> ''রচনাটি বাস্তবিকই বারবার পড়বার আর অনেকবার চমকে ওঠার মতো।...কবিতাটির সত্যিকারের আকর্ষণ তার আনন্দময় অনুভূতি আর অনাহত বিস্ময়বোধে।''

চিঠিতে 'শব্দ' এবং 'সার্থক মিল' ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে আঙ্গিকের আলোচনাও করেছেন।

দাঙ্গার ক্ষত দাগ রেখেছে দুটি কবিতায় : 'কৃষ্ণচূড়া' (দুরন্ত দুপুর) এবং 'কোনো স্বপ্ন ফেলে রাখতে নেই' (পরবর্তী কবিতা)। 'কৃষ্ণচূড়া'র আবহে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর নারকীয় তাণ্ডব। দেশের দাঙ্গাদীর্ণ পরিস্থিতিতেও কৃষ্ণচূড়ার গাছে ফুলে ফুলে রঙিন উচ্ছ্বাস :

> ''কত বুকের কান্না, আর কত বুকের শাপে
> ভেবেছিলেন ধরণী বুঝি রিক্ত হ'য়ে যাবে,
> লুপ্ত হবে আকাশঝরা-আলোয় ভরা মাস।
> তোমার কানে যায় না কোনো রোদন, হতাশ্বাস?
> কোন সাহসে বুক বেঁধেছো, কোন দুরাশায় বাঁচো?
> কৃষ্ণচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, এখনো তুমি আছো!''

এলগিন রোড থেকে সরু গলির ভেতরে সিগনেট প্রেসের বাড়িতে ঢোকার মুখে ছিল গাছটা।

এই সিগনেট প্রেসের ডি.কে. অর্থাৎ দিলীপ কুমার গুপ্তের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও মুগ্ধতা। ঋণস্বীকার করতেন বার বার। তাঁর আতিথেয়তার আশ্চর্য সব ব্যবস্থা; ক্লাসিক্যাল শিল্পী ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের শিষ্য সন্তোষ রায়ের কাছে সপ্তাহে একদিন সুর-তাল বিষয়ে তালিমের ব্যবস্থাও হয়েছিল আর অসামান্য সব গানের রেকর্ড শোনা হত প্রতি শনিবার। অম্লান দত্ত, ত্রিদিব ঘোষ, অশোক মিত্র, অরুণকুমার সরকার আরও অনেক বন্ধুরাও সঙ্গী হতেন। 'যুগান্তরে'র কাজ ছেড়ে সিগনেট প্রেসে বই সম্পাদনার কাজে যোগ দেন। ডি.কে.-র অধীনে 'টুকরো কথা' নামে বাংলা গ্রন্থের পরিচিতিমূলক একটি মাসিক বার্তা সম্পাদনা করেছেন। পরবর্তীকালে সিগনেট প্রেস ছেড়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন।

১৯৪৬-এ ১৬-২০ আগস্ট পাঁচদিনের সেই বীভৎস সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি কবিকে গভীরভাবে আলোড়িত করে :

> ''মেডিকেল কলেজের সামনে কত মানুষকে মেরে ফেলে রাখা হয়েছিল রাস্তার ধারে ফুটপাতের ধার ঘেঁষে — নর্দমার জল বয়ে যাচ্ছিল তাদের মৃতদেহের ওপর দিয়ে'' —

কলকাতায় কোয়েকারদের প্রধান হোরেস আলেকজাণ্ডার-কে বলে মেডিকেল কলেজের ভেতরে আশ্রয় নেওয়া কয়েক হাজার দাঙ্গাপালানো মানুষের জন্যে রান্না করবার দায়িত্ব চেয়ে নিয়েছিলেন তিনি। সাহায্য করতে এসেছিল যারা, একে একে চলে যায়। তিনি শেষ পর্যন্ত রয়ে গেলেন। কলেজের এমারজেন্সির মেঝেয় শুয়ে রাত কাটিয়ে প্রকাণ্ড সব কড়াই-এ সারাদিন ধরে খিচুড়ি রান্না করা সহজ ছিল না। অল্প বয়সের শক্তি আর হৃদয়ের আবেগ দিয়েই সময়টা সামলেছিলেন।

এরপরে ১৯৪৭ সালের ২৯ এপ্রিল কবি পাটনায় গিয়ে পনের দিন ছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীর আমন্ত্রণেই যাওয়া। আন্ধেরি গ্রামে যাওয়ার সময় পার হয়েছিলেন পুনপুন নদী। ক্ষয়ক্ষতির হিসেব, যাত্রাপথের ম্যাপ, গ্রামের বসতবাটির ম্যাপ, জীবিত, মৃত এবং নিরুদ্দিষ্টের সংখ্যা, রিপোর্ট লিখে পাঠাতেন

'যুগান্তর' পত্রিকায়। চারিদিকে দেওয়ালে ছিটকে পড়া কত কত রক্তের বীভৎস দাগ আমৃত্যু তাঁর মন থেকে মুছে যায়নি :

> ''কোনো স্বপ্ন ফেলে রাখতে নেই। রাখলেই ধুলো জমে, ঘাসে ঢাকে,
> মগজের পাইকা হরফগুলো চেটে দেয় ভুল মাকড়সাতে।" [পরবর্তী কবিতা]

যুদ্ধ-দাঙ্গা তাঁর কবিতায় প্রকট হয়ে ওঠেনি। এই প্রসঙ্গে কবির বক্তব্য তাঁর গভীর জীবনদর্শনকেই প্রকাশ করেছে :

> ...''সর্বত্রই অমানুষিক, বর্বরোচিত অত্যাচার হয়েছে। তা নিয়ে কবিতা লিখলেই মানুষের ভালো হবে, সমাজ বদলে যাবে? আমি বিশ্বাস করি না। যদি পারি, নিজেকে ভালো হতে হবে, তা দেখে অন্যেরা যদি খানিকটা ভালো হওয়ার চেষ্টা করে — তবে হয়তো বদল হতে পারে। তা বলে কবিতা লিখে সমাজের বদল হবে, আমি তা মনে করি না।
> মানুষের দুঃখে গভীরভাবে দুঃখী হওয়ার ক্ষমতা তোমার আছে কি না সেটাই আসল কথা — কবিতা লিখব তা নিয়ে, আমি ভাবতেও পারি না। ঠাট্টার মত শোনাচ্ছে!"

চোরুচন্দ্র কলেজ ছেড়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে যোগ দিলেন (১৯৫৬) শিক্ষক বুদ্ধদেব বসুর আমন্ত্রণে। বুদ্ধদেব যাদবপুর ছেড়ে গেলেও তিনি রয়ে গেলেন। নকশাল আন্দোলনের দিনগুলিতে উদ্বেগের সঙ্গে রাত অবধি বিভাগে কাজ করা, উপাচার্য গোপাল সেনের কর্মজীবনের শেষ দিনে নকশালদের হাতে খুন হওয়া তাঁকে বিচলিত করেছিল। 'বিদিশার ইনি আর উনি'-র 'বোধোদয়' কবিতায় অতিবাম রাজনীতিসূত্রে বিপদগ্রস্ত খোকন মোহনদের প্রতি মমতার ছোঁয়া লেগে আছে।

বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীর প্রতি আজীবন শ্রদ্ধা ছিল তাঁর। দাঙ্গার পর খবর প্রকাশে মতান্তর হয় 'যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গে। দাঙ্গায় দু'পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত; কোনও একটি পক্ষের বিরুদ্ধে লিখবেন না বলেই সরে যান। বিহার থেকে ফেরার পথে রাজগীর, নালন্দা, সারনাথে যান। 'লোকটা' কবিতায় জড়িয়ে আছে তারই অনুষঙ্গ :

> ''আকাশে সোনার মুখ দেখছে সারনাথে কে নতুন,
> ধুলো-পা, আবিষ্ট চোখ, ব'সে থাকে মস্ত নীল মাঠে!...
> সে পায়নি করুণা যাঁর, প্রভু তথাগত,
> কেন এ-লোকটাকে ফেরালেন তিনি!"

চল্লিশের দশকে সাম্যবাদী কবিতার ধারার বিপরীতে রোমান্টিক গীতিগুঞ্জনের ধারায় কবিতা রচনা করে পাঠককে আবিষ্ট করেছেন কবি; 'দুরন্ত দুপুরে'র কবিতার আবেশ পাঠককে মুগ্ধ করে রেখেছে :

> ''দুপুরে দুরন্ত হাওয়া : মনে পড়ে, কাকে মনে পড়ে।" [দুরন্ত দুপুর]

> ''দূরে এসে ভয়ে থাকি : সে হয়তো এসে ব'সে আছে।
> হয়তো পায়নি ডেকে, ...
> শান্তিনিকেতনে বৃষ্টি ছুটি শেষ। ভিজে আলতা লাল

শূন্য পথ।...
কলকাতায় ফিরে যদি — যদি আজ বিকেলের ডাকে
তার কোনো চিঠি পাই? যদি সে নিজেই এসে থাকে?" [শান্তিনিকেতনে ছুটি]

সম্পর্কের ছিন্নসূত্র গাঁথার প্রয়াসে রয়েছে বিষণ্ণতা।
দুপুরের আবেশে মুগ্ধ হয়ে আটকে রইলেন কত পাঠক; কিন্তু কবি রইলেন না। শুধু ভাবতরঙ্গে নয় কবিতার অঙ্গে অঙ্গেও এল বিবর্তন; শান্তিনিকেতনের চরিত্র বদলের কথা এল পরবর্তী কবিতায়; বিনোদন হয়ে গেছে সব :

"বনবাস হ'য়ে উঠবে মহা এক বিশ্ববিদ্যালয়
একালের জুয়াড়ীর কপালের লেখা হয়তো নয়।...
এবং, শুনেছি জনরব,
সে-অরণ্যে পাঁচ তারায় সপ্তাহান্তে বনবাস অবশ্য সম্ভব :

দ্রৌপদীকে পণ রেখে, তাইলে আর এক দান পাশা
কী এমন হবে সর্বনাশা?" [জুয়াড়ীর দুর্বিপাক]

বিশ্বভারতীর উপাচার্য অম্লান দত্তের প্রস্তাবে রাজি হয়ে কবি যাদবপুর ছেড়ে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন (১৯৮২)। সেখানে অন্য কাজের অবকাশে রবীন্দ্রনাথের রচনার concordance তৈরির কাজ বেছে নেন এবং অনেক বিরোধিতা সত্ত্বেও কাজটি এগিয়ে নিয়ে যান।

'অলৌকিকে' (দুরন্ত দুপুর) কলকাতাবাসের কথা আছে; রোমান্টিক সুর লেগে আছে প্রাত্যহিক গ্লানির ওপরে। 'পরবর্তী কবিতা'-র 'কলকাতা বৃত্তান্ত' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বাস্তবতার উপস্থাপনায় :

....."এসে পড়লেন স্বাধীনতা :
সাঙ্গ হ'লো এতকালের তাধিন তাধিন তাধিনতা।
তখন হ'লো মালুম,
আপদগুলো পালায়নি কেউ যখন কিনা বাঘ বললে হালুম।
নাম ভাঁড়িয়ে কুমির কী সাপ, দেখা গেলো, সবাই আছেন টিকে
ডাইনে বাঁয়ে বাবুর চতুর্দিকে।...
কণ্ঠাগত প্রাণে কেমন ধুঁকছে উপনিবেশী কলকাতা,
হাড্ডিসার স্বদেশী কলকাতা।"

হতাশা, আক্ষেপ শ্লেষ ছড়িয়ে আছে কবিতায়।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটেন, রাশিয়া, আমেরিকা যথাক্রমে সিংহ, ভালুক, ঈগলের প্রতীকে পাড়াদখলের লড়াই :

"শান্তিও যদি সিংহের মতো গর্জায়,
তাকে ডরাই;
ভালুকের মতো আগলিয়ে থাকে দরজায়,

তাকে ডরাই;
ঈগলের মতো বাঁকা নখে পড়ে ঝাঁপিয়ে,
ডুকরিয়ে ওঠে গৃহস্থপাড়া কাঁপিয়ে,
বুড়ি ছুঁতে গিয়ে অবেলায় পড়ে হাঁফিয়ে,
তাকে ডরাই।" [শান্তিও যদি]

অন্তঃসারশূন্য রাজনীতি পৃথিবীকে 'মহান তাসের ঘর' করে তুলতে চাইছে :

"অপূর্ব কুশলী এক শিল্পী এলো, শূন্যে তোলে ছাদ;
গম্বুজে আকাশ ছোঁয় দেখতে-দেখতে তাসের প্রাসাদ।
এখনো দেয়াল বাকি, সবশেষে গড়া হবে ভিত।...
গোলামের ঠোঁটে জ্বলে ধিকি ধিকি শস্তা সিগারেট,
বিবিদের আশেপাশে বাবুদের রপ্ত এটিকেট
সন্ধ্যার সুরভি খোঁজে।" [একটি স্বদেশী নাটক]

রাজনীতির প্রচলিত পথে কবির গভীর অনীহা। তাতারের কবিতায় সমাজের বীভৎস রূপ; পরবর্তী কবিতাতেও আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে; 'অস্থিসার উপত্যকা', 'কঙ্কাল করোটি খসা ঝড়', 'তৃষ্ণার সমুদ্র থেকে দানবের চোখ তোলা সূর্য', মরুভূমির মনসার বনে বুদ্ধের অভয় মুদ্রাও অর্থহীন হয়ে যায়, সময়ের পাকা ফল ভোগে যায় অদৃশ্য বায়সের। এক একটা জন্মদিন যেন মরুভূমিতে 'বিকল্প উটের সার', সময়ের 'বারুদে অন্ধকারে' ক্রমশ একা হয়ে যায় মানুষ। নিঃসঙ্গতার অব্যক্ত যন্ত্রণায় ভারি হয় বাতাস :

"... সব সখা সখী কত অসম্ভব একা।...
অন্ধকারে হাতে ঠেকে বন্ধ ভারি নিরেট কপাট।
ভিন্ন ঘরে রাত বাড়ে, শূন্য হয় সতীশেরও পাশে শূন্য খাট।" [দুই দৃশ্য]

পৌরাণিক প্রসঙ্গকে ব্যবহার করেছেন আধুনিক অনুষঙ্গে :

"কোথায় লুকোবে তূণ? হায় সব শমীশাখা থেকে
অন্তহীন পাতা ঝরে যায়।" [অজ্ঞাতবাসের ভূমিকা]

মৃদুতা সত্ত্বেও ব্যঙ্গ বিদ্ধ করে লক্ষ্য :

"কাপাস খেতে আপিস হ'লো মাটি ঢাকলো পাপোষ পরিপাটি!
যত ছিলো কুকুর-চাটা শেয়ালকাঁটার বন
কেটে কখন করলে সিংহাসন।" [কলকাতা বৃত্তান্ত]

একটি বিশিষ্ট ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত সমালোচনার প্রতি উত্তরে লেখা 'ক্রিটিক' কবিতাটি বাস্তবকে অতিক্রম করে কৌতুক কটাক্ষে উপভোগ্য :

"আমি তাকে স্নেহ করি, অনুরাগ ভরে শুনি
খাদ্যাখাদ্যে অভিজ্ঞতা তার।

হেন বিজ্ঞ জীব দেশে থাকা দরকার।
একমাত্র সে-ই
টিকটিকি দেখেছে চেটে, ওতে
কিচ্ছু খাবার নেই।"

ইয়েট্‌স্ এই নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কবির গবেষণা এবং আবেগ : 'পাতার কবরশায়ী অম্লেয় ইয়েটস্...' [আমার বন্ধুকে (অম্লানের জন্য)]; 'হাওয়ার হাঁস' কবিতাটি মনে করিয়ে দেয় ইয়েটস্ এর 'The Lake Isle of Innisfree' এবং 'The Stolen Child' কবিতা। 'এবার কি জলে লিখে নাম / চ'লে যেতে হবে?'। (এক বর্ষার বৃষ্টিতে)-এর ভিতরে গুণগুণ করে কীটসের সমাধিলিপি। 'ভয়' কবিতার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ডিলান টমাসের কবিতার অনুষঙ্গ।

দিনের শেষে কবি ফিরতে চান রূপকথার দেশে যেখানে 'কাহিনীর কালো চুলে শৈশবের আচ্ছন্ন হৃদয়'। 'বিদিশা'র অনেকগুলি কবিতায় রয়েছে শিশুদের কথা; মিষ্টিমধুর জগতের ছবি ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন; কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করেননি; দগ্ধ হওয়া শৈশবের কথা এসেছে 'সুখী নামের মেয়েটা' কবিতায়। ছোটদের জন্য লেখা কবিতার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় 'রুমির ইচ্ছা' ; বুদ্ধদেব বসুর কনিষ্ঠা কন্যা দময়ন্তীকে (রুমি) নিয়ে আরও একটি কবিতা 'লাখো বছরের পুরনো জমিতে'। পরে এই নামে একটি সংকলন করে কবিকে উপহার দিয়েছিলেন শিল্পী চিত্তপ্রসাদ।

ছন্দমিলের বিশেষত্ব প্রথম দিকে পাঠকের কান ও মনকে মাতিয়ে রেখেছে। কবি পরবর্তীকালে সহজসরল গদ্যের চলনে মিশিয়ে দিয়েছেন। ছন্দের বিন্যাসে নকশার বুনন বারবার বদলে পাঠকের প্রত্যাশাকে ভিন্ন খাতে বইয়ে দিয়েছেন, নকশাটা লুকিয়ে মননকে ছুঁয়ে দিয়েছেন। তিন রীতির ছন্দেই তিনি স্বচ্ছন্দ; ক্রমশ কথ্যভঙ্গির চলন এসেছে :

"এই যে, বকুল, কখন এলে?
কে না একদিন ছিল তোমাদেরই প্রাণের দোসর? দু'দিনে সে-ছেলে
পর হয়ে গেলো! সাধু সাধু! তবু কী যে ভালো নাম
বাবা-মা তোদের দিয়েছে, তাঁদের শতেক প্রণাম।" [স্বগত]

মিশ্রবৃত্ত মুক্তকে বয়ে চলেছে 'ট্রেন' কবিতাটি। 'শব্দ' নিয়ে কবির অতৃপ্তির শেষ নেই; 'সব কবিতাকেই ঈপ্সিত রচনার খসড়া ব'লে মনে করতে অভ্যস্ত'। প্রতীক ব্যবহারে তাঁর 'প্রভূত সার্থকতা' অর্জনের কথা সমসাময়িক লেখকেরা বলেছেন; 'ভাসমান লাল বয়া' , 'রোদ্দুরের চৌকো খাম', 'দুরাশার সিঁড়িতোলা অজানা স্টেশন' ইত্যাদি। কাব্যভাষায় বিবর্তন এসেছে। তাতারের কবিতা কিছু খর হলেও তীব্রতর নয়; মৃদুতাই তাঁর কবিতার মুখ্য মণ্ডনকলা। পুনরাবৃত্তি নেই কবিতাচর্চায়।

কবির আবেগ ছিল বইটি ঘিরে। কিন্তু প্রকাশের আগেই কবি আমাদের ছেড়ে চলে যান। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ কলকাতা বইমেলায় বইটি প্রকাশিত হয় সন্দীপ দত্তের উদ্যোগে (কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র); উদ্বোধক কবির বন্ধু অম্লান দত্ত। স্মৃতিভারাতুর মনে সাক্ষী হয়ে রইলেন অমিয় দেব, সুভদ্রকুমার সেন, প্রবীরকুমার হুই, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, শুভাশিস চক্রবর্তী ('অহর্নিশ'-এর নরেশ গুহ সংখ্যা তখনও প্রকাশ হয়নি) এবং কবির গুণমুগ্ধ আরও অনেকে।

কবি প্রতিদিন দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন ৫ নং সত্যেন দত্ত রোডের বাড়ির

বারান্দায়; বাঁকের মুখে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন ফিরে দেখতাম দাঁড়িয়ে আছেন তখনও — আজও শতবর্ষে কবিতাপ্রেমী পাঠক সময়ের বাঁকে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন ফিরে দেখুন — দাঁড়িয়ে আছেন অনুজদের দিকে তাকিয়ে, 'স্বতন্ত্র কবির ঘর', তেমনই আভিজাত্য আর পারিপাট্য নিয়ে — কবি নরেশ গুহ...

---

১. কবি নরেশ গুহর জন্ম ১৯২৩ সালের মার্চে ৩ অথবা ৪ তারিখে হবে; এমনটাই কবির ধারণা ছিল। উনি নিশ্চিত নন জানিয়েছিলেন। তিথি দোল পূর্ণিমা ছিল কবি সে কথা বলেছিলেন।
পরবর্তীকালে সাউথ সাবার্বান স্কুল (মেন)-এর শিক্ষক সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় ওই তিথি স্মরণে রেখে অন্বেষণ করে তারিখটি নিশ্চিত করেন : ৩ মার্চ ১৯২৩ শনিবার / ১৯ ফাল্গুন ১৩২৯ (বঙ্গবাসী পঞ্জিকা : ১৩২৯, কলিকাতা ৩৮/২ ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রিট, বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো-মেশিন প্রেস থেকে শ্রী নটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, পৃষ্ঠা : ৩৩৯-৩৪১)।

তথ্যসূত্র :

কবিতা থেকে কবি : নরেশ গুহ, স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়; কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি ১৪১৫ (কলকাতা পুস্তক মেলা ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় : গবেষক, প্রাবন্ধিক, কবি এবং সরকারি কলেজের অধ্যাপক।